কুরআন ও হাদীসের আলোকে
সামুদ্রিক অভিযান
মুহাম্মাদ ওমর ফারুক

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

সামুদ্রিক অভিযান

সংকলনে ঃ

মুহাম্মাদ ওমর ফারুক

প্রকাশনায় ঃ

মাক্তাবাতুল জিহাদ বাংলাদেশ

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি সমগ্র জাহানের সৃষ্টিকর্তা। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম মহামানব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যার উসিলায় সৃষ্টি এ বিশ্ব জাহান।

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের গৌরবময় অবদানের অনেক কিছুই আজ মুসলমানদের অজ্ঞতা এবং অন্যদের সচেতন চক্রান্তের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে। অথচ কয়েক শতক আগ পর্যন্ত বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানরা নেতৃত্বের আসনে ছিল অধিষ্ঠিত। সারা দুনিয়া তাদের ভয়ে ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের নৌ-ক্রিয়া কান্ডের দরুন ভূমধ্যসাগরের পানি সব সময় ঘোলা থাকতো। ভূমধ্যসাগর, মারমোরা সাগর, ঈজীয়ান সাগর, কৃষ্ণ সাগরে কোন শক্তি-ই মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারতো না।

ইউরোপীয় সম্মিলিত নো-বাহিনী তাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াত। যেমন করে পালিয়ে বেড়ায় ছোট ছোট পাখীরা বাজ পাখীর ঝাপট থেকে। মুসলমানদের বিনা অনুমতিতে কোন জাতিরই যুদ্ধ জাহাজ ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ করতে পারতো না। মুসলিম নৌ-বহরগুলো সাগরময় সর্বক্ষন শিকার খুজে বেড়াতো এবং শত্রু জাহাজ দেখা মাত্র ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঝাপিয়ে পড়তো।

কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, মুসলমানদের সেই ইতিহাস আজ আমরা বে মা'লুম ভূলে গেছি। জন সাধারণ বা তরুণ সমাজ তো দুরের কথা অনেক প্রবীন বিদগ্ধজন ও আলেম সমাজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখে না।

আজ ইসলামী বই-পুস্তক ভান্ডারের দিকে তাকালে অনেক ধরনের বই মিলে। কিন্তু এই বিষয়ের উপর তেমন কোন বই পাওয়া দুস্কর।

তাই ইচ্ছে করলাম এ বিষয়ে সামান্য কিছু লেখার চেষ্টা করি। যেন মুসলিম জাতি নিজেদের সেই গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিজ্যের কথা আবারও স্বরণ করতে পারে। বিশেষ করে তরুন সমাজ যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় জীবনকে এ পথে উৎসর্গ করতে পারে।

আমরা গ্রন্থখানীকে ভূল ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদ্বসত্ত্বেও যদি কোন ভুল থেকে যায় তবে তা জানিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল।

অবশেষে এই কামনা করি যেন আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থখানা দ্বারা এর সংকলক, প্রকাশক ও এদের সহযোগীদের কামিয়াবী দান করেন।

বিনীত
ওমর ফারুক

উৎসর্গ

মরহুম জনাব মুহাম্মাদ হুসাইনুজ্জামান ভূঁইয়া (রহঃ)

এর

রুহের মাগফিরাতে

বিন্যাস ধারা

ঘটনা সমূহ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

কুরআনে নদ-নদী ও নৌযান প্রসঙ্গ

মহা গ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নদ-নদী ও নৌযান সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। কুরআন মুসলিম জাতিকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, নদ-নদী ও নৌযান সমূহ আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নিয়ামত। যে জাতি এটা করায়ও করতে পেরেছে, তারাই দুনিয়ার নেতৃত্বে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছে।

নিম্নে আমরা কুরআনের কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছি। এতেই অবগত হওয়া যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নদ-নদী ও নৌযান সমূহকে একটা জাতির উন্নতি ও উৎকর্ষের পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করেছেন–

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

(١) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ

(১) অর্থ ঃ আর সাগরে সঞ্চালিত পর্বতের ন্যায় বৃহৎ জাহাজগুলো ও তারই অধিকার ভুক্ত। (সুরা, আর-রহমান-আয়াত নং-২৪)

(٢) اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

(২) অর্থ ঃ তিনিতো আল্লাহ্ যিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্য সাগরকে বশীভূত করেছেন। যেন তাতে আল্লাহর হুকুমে নৌযানগুলো সঞ্চারিত হতে পারে এবং যেন তোমরা এর সাহায্যে তাঁর অনুগ্রহদান লাভ করার চেষ্টা পেতে পার এবং যেন তোমরা তার শুকরিয়া আদায় করতে পার।

(সূরা, জাসিয়া, আয়াত নং-১২)

(٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ -

(৩) অর্থ ঃ তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ যমীনের সব কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং নৌযানগুলো তাঁরই হুকুমে সাগরে সন্তরণ করে থাকে। (সূরা হজ্জ, আয়াত নং-৬৫)

এ ধরণের আরও বহু আয়াত নদ-নদী ও নৌযান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সমস্ত আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নদ-দনী ও নৌযানগুলোকে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতির জন্য নেয়ামত হিসেবে দিয়েছেন, যেন তারা এর দ্বারা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। এবং এর দ্বারা জিহাদের কাজকে আঞ্জাম দিতে পারে।

সামুদ্রিক জিহাদ সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি ভঙ্গি

(١) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعْ رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِىْ، فَعَلَيْهِ الْغَزْوُالْبَحْرِ. (طَبْرَانِىْ شَرِيْف)

(১) হযরত ওয়াসেলা বিন আস্‌কা'আ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন– হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি আমার সহিত মিলে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। তার জন্য উচিৎ সে যেন সামুদ্রিক জিহাদে অংশ গ্রহণ করে। (তিবরাণী শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত হাদীসে বুঝানো হয়েছে যে, সামুদ্রিক জিহাদের এতই মর্যাদা যে, এতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র ও মাকবুল জিহাদের ন্যায় সাওয়াব অর্জিত হয়।

তাই যার এ ইচ্ছে হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জিহাদের ন্যায় সাওয়াব অর্জন করবে সে যেন সামুদ্রিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। উক্ত সাওয়াব এ যুগেও অর্জিত হবে।

সারকথা সামুদ্রিক জিহাদ স্থল ভাগের জিহাদের চেয়ে দিগুণ মর্যাদা সম্পূর্ণ। এর কারণ হল যে, সামুদ্রিক সফর এমনিতেই কষ্টকর। আবার ততসঙ্গে দুশমনের মুকাবিলা করা তো আরও কষ্টকর। দুশমন ছাড়াও সাগরে ধ্বংস হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন, কখনও হয়ত বড় ধরণের কোন ঢেউ এসে জাহাকে তলিয়ে নিতে পারে। হয়ত বিশাল কোন জল প্রাণী প্রাণ নাশের কারণ হতে পারে ইত্যাদি।

তা ছাড়া মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সাগের না পাওয়া যাওয়াটাতো একেবারেই স্পষ্ট কথা।

তাই এসব কারণে সামুদ্রিক যুদ্ধকে স্থল ভাগের যুদ্ধের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

যেমন এক হাদীসে এসেছে– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) একজন মুজাহিদকে সামুদ্রিক অভিযানে যেতে দেখে প্রশ্ন করলেন, হে ভাই! কোথায় যাচ্ছ ? সে মুজাহিদ উত্তর দিল– সামুদ্রিক যুদ্ধে যাচ্ছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- কতইনা উত্তম তোমার এই সফর। কতইনা সোন্দর তোমার এই সাওয়ারীটি।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে সামুদ্রিক যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন- উত্তরে তিনি বল্লেন সামুদ্রিক একটি জিহাদ স্থল ভাগের দশটি জিহাদের সমতুল্য। আর সাগরে যুদ্ধ করতে গিয়ে মাথায় চক্কর* খাওয়া সাওয়াবের দিক দিয়ে এমন যেমন স্থল ভাগের যুদ্ধে কোন ব্যক্তি নিজের রক্তে ভিজে উলট পালট হচ্ছে। আর যে ব্যক্তি সাগর পাড়ি দিল সে যেন জিহাদের পথে সমস্ত উপত্যকা ভ্রমণ করল।

(দাওয়াতে জিহাদ)

টীকা ঃ সামুদ্রিক যুদ্ধে সোগরে অবস্থান কালে সাধারণত হাওয়া ও পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে মাথায় ঘুর্ণন ও চক্কর সৃষ্টি হয়। আর মাথায় এই ধরণের ঘুর্ণনের আল্লাহর নিকট খুবই মূল্য রয়েছে। এর কারণে আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদকে বহু সাওয়াব দান করবেন।

সর্বোত্তম শহীদ

(٢) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ شِهَابٍ رَضِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِىْ، فَلْيَغْزُ فِى الْبَحْرِ، فَاِنَّ قِتَالَ يَوْمٍ فِى الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ قِتَالِ يَوْمَيْنِ فِى الْبَرِّ، وَاِنَّ اَجْرَ الشَّهِيْدِ فِى الْبَحْرِ كَاَجْرِ الشَّهِيْدَيْنِ فِى الْبَرِّ، وَاِنَّ خِيَارَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَصْحَابُ الْكَفِّ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ اَصْحَابُ الْكَفِّ ؟ قَالَ قَوْمٌ تَكْفَأُ عَلَيْهِمْ مَرَاكِبُهُمْ فِى الْبَحْرِ - (طبرانى شريف)

(২) অর্থ ঃ হযরত আলকামা বিন শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যার আমার সহিত মিলে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ হয়নি, সে যেন সামুদ্রিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। কারণ সমুদ্রের এক দিনের জিহাদ স্থল ভাগের দু'দিনের জিহাদের চেয়েও উত্তম। আর সামুদ্রিক জিহাদের একজন শহীদ স্থল ভাগে শাহাদাত বরনকারী দু'জন শহীদের সমান সাওয়াব পাবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত শহীদান তারা যারা 'আকাফ' গুণে গুনান্নীত। সাহাবাগণ আরয করলেন- হে আল্লাহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আকাফ' ওয়ালা কারা ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সমুদ্রে যাদের নৌকা তথা নৌযান উল্টে যাবে, তারাই হল 'আকাফ' গুণে গুনান্নীত। (তিবরাণী শরীফ)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ غَزْوَةٌ فِى الْبَحْرِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ قِنْطَارٍ مُتَقَبَّلاً -

كتاب الجهاد لابن مبارك صـ ١٧٦

(৩) অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন– সামুদ্রিক জিহাদ আমার নিকট ঐ স্বর্ণ খানি থেকেও উত্তম যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা হয়েছে এবং যা আল্লাহ্ কবুলও করে নিয়েছেন।

(কিতাবুল জিহাদ লি ইবনে মুবারক)

দশ হজ্ব থেকেও উত্তম

(٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزْوَاتٍ، وَغَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ، وَغَزْوَةٌ فِى الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزْوَاتٍ فِى الْبَرِّ وَمَنْ اَجَازَ الْبَحْرَ مَكَانَّمَا اَجَازَ الْاَوْدِيَةَ كُلَّهَا وَالْمَائِدُ فِيْهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِى دَمِهٖ (طبرانى شريف)

(৪) অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি হজ্ব করেনি, তার একটি হজ্ব দশটি জিহাদ হতেও উত্তম। আর যে ব্যক্তি হজ্ব করেছে তার একটি জিহাদ দশটি হজ্ব অপেক্ষা উত্তম। আর সমুদ্রের

একটি যুদ্ধ স্থলভাগের দশটি যুদ্ধ হতেও উত্তম। আর যে ব্যক্তি সমুদ্র অতিক্রম করেছে, সে যেন সমস্ত উপত্যকা অতিক্রম করেছে। আর সামুদ্রিক যুদ্ধে যার মাথায় ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়েছে, সে সাওয়াবের দিক দিয়ে এমন ব্যক্তির ন্যায় যেমন কোন ব্যক্তি নিজের রক্তে মিশ্রিত হয়ে ভেজে গেছে।

ফায়দা ঃ উল্লেখিত হাদীসে একটি হজ্বকে দশটি জিহাদ থেকে উত্তম বলা হয়েছে। তা তখনি যখন জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকে। কিন্তু যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় তখন জিহাদ করাটাই প্রধান্য পাবে।

দুই শহীদের সাওয়াব

(১) হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন– হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– সামুদ্রিক জিহাদে যার মাথায় ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়েছে অথবা বমি এসেছে সে এক শহীদের সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি সামুদ্রিক যুদ্ধে গিয়ে ডুবে গেল সে দু' শহীদের সমান সাওয়াব পারে।

(মাসারিয়ে আশওয়াক)

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন– আমি যদি পুরুষ হতাম, তবে শুধু সামুদ্রিক অভিযানে শরীক হতাম। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তির সামুদ্রিক জিহাদে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে এবং মাথায় ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়েছে সে সাওয়াবের দিক দিয়ে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে স্থল ভাগের জিহাদে নিজের রক্তে ভিজে উলট পালট হচ্ছে।

(কিতাবুস সুনান)

জল ভাগের শহীদ স্থল ভাগের শহীদ হতে উত্তম

(১) হযরত সা'দ বিন যানাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন– হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- সামুদ্রিক অভিযানের শহীদগণ স্থল ভাগের শহীদগণের চেয়ে উত্তম। (মাসারিউল আশওয়াক)

যে শহীদের ঋণ ও মাপ হয়ে যায়

এক রেওয়ায়েতে এসেছে- আল্লাহ্ তায়া'লা মানুষের রূহ্ কবয করার জন্য ফেরেস্তা নিযুক্ত করেছেন। ফেরেস্তারাই মানুষের রূহ্ কবয করবেন। কিন্তু সামুদ্রিক জিহাদে শাহাদাত বরণকারী শহীদদের রূহ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে কব্য করবেন। আর স্থল ভাগে শাহাদাত বরণকারীর শুধু ঋণ ব্যতিত সব গোনাহ্ মাপ করে দেয়া হয়। কিন্তু সামুদ্রিক জিহাদে শাহাদাত বরণকারীর করয সহ্ সব গোনাহ্ই মাপ করে দেয়া হয়। (মাসারিউল আশওয়াক)

এক দিনে এক মাসের সাওয়াব

এক বর্ণনায় এসেছে সামুদ্রের একদিনের জিহাদ স্থল ভাগের এক মাসের জিহাদ হতেও উত্তম। আর সমুদ্রের এক মাসের জিহাদ স্থল ভাগের এক বৎসরের জিহাদ হতেও উত্তম।

– অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে- যে, একজন সাহাবী অর্থাৎ হযরত মাসলামা বিন মাখলাদ (রাঃ) সামুদ্রিক জিহাদে অংশ গ্রহণকারী গাজীও মুজাহিদীনদের ব্যপারে বলেন– সামুদ্রিক জিহাদে অংশ গ্রহণকারীরাতো এমন যারা পেছনে কোন গোনাই রেখে আসেনি। অর্থাৎ তাদের সব গোনাই মাপ হয়ে গেছে। (মাসারিউল আশওয়াক)

আল্লাহর হাসি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে একটি মাওকূফ রেওয়ায়েত রয়েছে- তিনি বলেন– আল্লাহ্ তায়ালা সমুদ্রের মুজাহিদদের তিনটি অবস্থার উপর হেসে থাকেন। **এক** যখন তারা নিজেদের স্ত্রী ও ছেলে সন্তানদের ছেড়ে জিহাদের জন্য জাহাজে বসে যায়। **দুই** যখন তাদের মাথায় ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়। **তিন** যখন তারা সামুদ্রিক সফর শেষে স্থলভাগের দিকে গিয়ে অবস্থান করে। আর এ কথা চির সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার উপর হাসেন তাকে কখনও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। (মাসারিউল আশওয়াক)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) এর নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিভিন্ন ধরণের কিছু খাবার খেদে দিতেন। উম্মে হারাম ছিলেন হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) এর স্ত্রী। এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধ খালা।

ঘটনাক্রমে একদিন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) এর ঘরে গেলেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খানা খাওয়ালেন। অতপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা মুবারক উকুন সাফ করতে লাগলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে গেলেন কিছুক্ষন পর তিন এমতাবস্থায় জাগ্রত হলেন যে তিনি হাসতেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থা দেখে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) প্রশ্ন করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসছেন কেন ? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- স্বপ্নে আমাকে আমার উম্মতদের মধ্য হতে এমন কিছু লোকদের দেখানো হয়েছে যারা সমুদ্রের তরঙ্গে সাওয়ার হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তারা জাহাজের উপর বসে এমন ভাবে জিহাদ করবে যেমন কোন বাদশা তার সিংহাসনে বসে।

– হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) বলেন– আমি বললাম - হুযূর! আমার জন্য দো'আ করুন, আমি যেন সে সমস্ত ভাগ্যবান মুজাহিদগণের মধ্যে গণ্য হতে পারি।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দো'আ করলেন অতপর আবার ঘুমিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষন পর জাগ্রত হয়ে পূর্বের ন্যায় হাস্তে ছিলেন- হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) বলেন– আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসছেন কেন ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের ন্যায় উত্তরে বললেন– আমাকে স্বপ্নে আমার উম্মতের মধ্য হতে এমন কিছু

লোকদের দেখানো হয়েছে যারা সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর সাওয়ার হয়ে আল্লাহর পথে এমন ভাবে জিহাদ করবে যেমন রাজা বাদশারা তাদের মস্‌নদে বসে থাকে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দো'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের মধ্য গণ্য করে নেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তুমি প্রথম দেখা লোকদের মধ্যে গণ্য।

অতপর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এর খেলাফত কালে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) সামুদ্রিক অভিযানের জন্য সাওয়ার হয়ে ছিলেন। যখন সমুদ্র পাড়ি দিলেন তখন তিনি নিজ সাওয়ারী থেকে পড়ে ইন্তেকাল করেন।

(বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

অন্য এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমার উম্মতের মধ্য হতে প্রথম ঐ লস্কর যারা সামুদ্রিক পথে জিহাদ করবে তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) বললেন– হে আল্লাহ রাসূল! আমি কি তাদের মধ্য হতে ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হ্যাঁ তুমি তাদের মধ্য হতে। অতপর কিছুক্ষণ পর আবার বললেন– আমার উম্মতের মধ্য হতে প্রথম ঐ মুজাহিদ গ্রুপ যারা রুমী কায়সারদের শহরে জিহাদ করবে তাঁরা আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমাপ্রাপ্ত। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) বললেন– আমি কি তাদের মধ্য হতে ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– না বরং তুমি প্রথম গ্রুপের মধ্য হতে।

ফায়দা ঃ হযরত উম্মে হারাম ছিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধখালা। হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) এর স্ত্রী

হযরত মো'আবিয়া (রাঃ) এই উম্মতের প্রথম ঐ ব্যক্তি যিনি নৌ-বহর তৈরী করে সামুদ্রিক যুদ্ধের সূচনা করেন। (যার সাংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা বইয়ের শেষাংশে তুলে ধরেছি)

হযরত উসমান (রাঃ) এর খেলাফত কালে তিনি যেহেতু গভর্ণর ছিলেন তাই তিনি সর্ব প্রথম সামুদ্রিক যুদ্ধের সুচনা করেন এবং নৌ-বহরের মাধ্যমে সর্ব প্রথম 'কবরস' এর উপর হামলা করেন। এবং সে এলাকাটি বিজিত করেন। হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) নিজের স্ত্রী হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) সহকারে সেই সামুদ্রিক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। সামুদ্রিক সফর শেষ করেই হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)

ইন্তেকাল করেন। তার সাওয়ারীটি তাকে নিজ পিষ্ঠ থেকে ফেলে দেয় যার ফলে তার মৃত্যু ঘটে। হযরত মু'আবিয়ার (রাঃ) পর হযরত সুলাইমান বিন আব্দুল মালেক (রহঃ) সামুদ্রিক যুদ্ধকে নিজ খেলাফতকাল পর্যন্ত জারী রেখেছিলেন। তিনি স্থল এবং জল ভাগ উভয় পথে জিহাদ করেছেন। তিনি তার স্বীয় পুত্র মাসলামাকে দিয়ে 'কুসতুন্‌তুনিয়ায়' হামলা করিয়েছেন।

সারকথা ঃ সামুদ্রিক অভিযান সর্ব প্রথম যিনি সূচনা করেছেন তিনি হলেন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) আর উল্লেখিত হাদীসে প্রথম যেই গ্রুপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে তা দ্বারা সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর হাদীসে দ্বিতীয় যে মুজাহিদ গ্রুপকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে হতে পারে সে গ্রুপ দ্বারা হযরত সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক (রহঃ) এর গ্রুপকেই বুঝানো হয়েছে।

(দাওয়াতে জিহাদ)

সামুদ্রিক জিহাদের বরকত

হযরত খাইচামা (রঃ) বলেন– আমাদের সাথে 'তরাবলিস' (শামের একটি এলাকা) এলাকার একজন মুজাহিদ ছিল। তার নাম আসেম বলেই প্রশিদ্ধ ছিল। তার উপনাম ছিল 'আবু আলী'। তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। একবার আমি তাকে সপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম- হে আবু আলী! কেমন অবস্থায় আছ ? সে আমাকে উত্তরে বলল– মৃত্যুর পর আমাদেরকে উপনামে ডাকা হয় না। রবং আসল নামেই ডাক হয়। তখন আমি পুনরায় বললাম হে আসেম! কেমন অবস্থায় আছ ? সে উত্তর দিল আমি এক বিশাল রহমত ও সুউচ্চ অট্রালিকা বিশিষ্ট জান্নাতের দিকে চলে এসেছি। আমি বললাম কোন আমলের কারণে তুমি এত মর্যাদার অধিকারী হয়েছ।

সে উত্তরে বলল– বেশী বেশী সামুদ্রিক জিহাদে অংশ গ্রহণ করার ফলে আমি এত নেয়ামত ও সম্মানের অধিকারী হয়েছি।(ইবনে আসাকির)

সমগ্র পৃথিবী তো আমাদের-ই

৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যখন স্পেনের নিরীহ জনতার উপর খ্রীষ্টিয় অবাধ্য শাসকদের নির্যাতন ও নিপিড়ন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। 'রার্ডাক' নামক এক বিদ্রোহী শাসক সেখানকার জনগণের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতেছিল। সে 'কাউন্ট জুলীন' নামক এক ব্যক্তির মেয়ের ইয্যত লুণ্ঠন করেছিল। যার প্রেক্ষিতে কাউন্ট জুলীন রার্ডাকের বিরুদ্ধে মুসা বিন নাসীরের নিকট সাহায্য চাইল। মুসা বিন নাসীর সে সময় উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সে সময়ের খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের নিকট পত্র লিখলেন যে- 'এই অবাধ্য ও জালিম শাসক রুিদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা উড্ডিন করা প্রয়োজন'।

খলীফা ওয়ালীদ চিঠির উত্তরে লিখলেন যে, 'প্রথমে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরী ওয়াকেফহাল হও। অতপর খুব সর্তকতার সহিত একশ্যান কর।

এ পয়গাম পেয়ে মুসা বিন নাসীর গোপন ভাবে স্পেনের অবস্থা সম্পর্কে অবহতি লাভ করার জন্য ৯১ হিজরীতে স্বীয় গোলাম তরীফ কে পাঁচশত মুজাহিদ সহকারে স্পেনের দিকে পাঠালেন। তারা যখন ফিরে আসলো এবং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরী ওয়াকেফহাল হলো তখন তিনি নিজের অপর গোলাম তারেক বিন জিয়াদকে বার হাজার দুর্ধর্ষ সৈনিক সহকারে স্পেনের উপর আক্রমন করার জন্য পাঠালেন। তারিক বিন জিয়াদ যখন স্পেনের দিকে রওয়ানা দিলেন তখন তাকে এবং তার সৈন্যদের সামুদ্রিক পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল। তাই তিনি নৌকা ও জাহাজের মাধ্যমে নিজ সাথীদের নিয়ে স্পেনের নিকটে 'জাবালে তারেক' এ গিয়ে অবস্থান করলেন। অতপর তারেক বিন জিয়াদ (রঃ) নিজ সাথীদের আদেশ দিলেন যে, আমরা যে সমস্ত নৌকা ও জাহাজ দ্বারা সাগর পাড়ি দিয়েছি সে সবগুলোকে জালিয়ে দাও।

কেউ তাকে প্রশ্ন করেছিলেন– আমরা স্বীয় দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে এসেছি আর আমাদের ফিরে যাওয়ার উপায় তো এ নৌকা ও জাহাজগুলো-ই ছিল। আর তা আপনি জালিয়ে দিচ্ছেন- অপর দিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে উসীলা

টীকা ঃ সেই ঐতিহাসিক পাহাড়টি ইতিহাসের পাতা থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য ইংরেজরা আজ তার নাম দিয়েছে 'জাব্রালড়'।

ইখতিয়ার করাতো অবৈধ নয়। এখন অবস্থা হল যে, আমাদের সামনে দুশমন পেছনে দরিয়া আর আমরা হলাম উভয়ের মাঝে। এই অবস্থায় পার হওয়ার নৌযানগুলোকে জালিয়ে দেয়া সমীচিন হয়েছে?

হযরত তারেক বিন জিয়াদ (রঃ) একটু মুস্কি হাসি দিলেন বললেন– যে দেশে আমরা প্রবেশ করে ফেলেছি, সে দেশতো আমাদের-ই। অতপর তরবারীর গোড়ায় হাত দিয়ে বললেন– যেটা হবে আল্লাহর দেশ সেটা-ই হবে আমাদের দেশ। এরপর তারেক বিন জিয়াদ (রঃ) অগ্নিঝরা বক্তব্য দিলেন এবং বললেন– হে মুসলিম সৈনিকগণ! জিহাদের ময়দান থেকে পালায়ন করার কোন পন্থা তোমাদের নেই। তোমাদের সামনে বিশাল দুশমনের বহর। আর পেছনে রয়েছে উত্তাল তরঙ্গঁ প্রবাহিত বিশাল সাগর। আল্লাহর শপথ! এখন শুধু দৃঢ়পথ থেকে নিপুনতার সহিত লড়াই করার ভেতরই রয়েছে তোমাদের সফলতা।

হে মুসলমানগণ তোমরা আমার পেছনে চলতে থাক। আমি যদি আক্রমন করি তবে তোমরাও আক্রমন করবে। আর যখন আমি হামলা বন্ধ করব, তোমরাও হামলা বন্ধ করবে। আমার সহিত একাত্মা ও এক দেহের ন্যায় হয়ে যাও।

অতপর তারেক বিন জিয়াদ (রঃ) দুশমনদের উপর এমন প্রচন্ড হামলা করলেন যে, দুশমন পালায়ন করতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। আর 'রার্ডাক' আক্রমন দিশেহারা হয়ে এমন ভাবে পালায়ন করেছিল যে, নিজে গিয়েই সাগরে ঝাপ দিয়েছিল। আর সেখানে তার মৃত্যু ঘটল। 'তলিতলাহ' মুসলমানদের কারায়েত্তে এসে পড়ল। স্পেন ও উন্দুলুস মুসলমানরা বিজয় করে নিলো। অতপর 'আশিবালা' বিজয় করলেন। এরপর কুরতুবা ফাতাহ করলেন। এ ভাবে সে নওজাওয়ান চমৎকার এক ইতিহাস রচনা করেন।

(দাওয়াতে জিহাদ)

দজলার উত্তাল তরঙ্গেঁ

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রঃ) যখন ইরানীদের বিরুদ্ধে হামলা করতে গিয়ে দিজলা নদীর তীর পর্যন্ত পৌছলেন। তখন ইরানীরা নিজেরা নদী পার হয়ে নদীর পুল ও কালবার্ড ইত্যাদি সব ভেঙ্গেঁ চুরে তছনছ করে চলে গিয়েছিল।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কিছু দিন পর্যন্ত নদীর তীরে অপেক্ষা করলেন। অবশেষে তিনি বিশাল এই সৈন্যদলটিকে দিজলা নদীতে ঝাপ দিয়ে তা পাড়ি দেয়ার নির্দেশ দিলেন সবাই নদীতে ঝাপ দিলেন। পানির উপর শুধু ঘোড়া ও মানুষ-ই দেখা যাচ্ছিল। এই দৃশ্যটি দুর থেকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) সাগরের মাঝ থেকে এই দৃশ্য দেখতে ছিলেন আর পড়তে ছিলেন–

ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

(অর্থাৎ ইহা মহা পরাক্রমশালী ও মাহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আয়ালার কুদ্‌রতেই হচ্ছে। ইরানীরা কিনারা থেকে মুজাহিদদের প্রতি কিছু তীর নিক্ষেপ করেছি, মুজাহিদরা নদীর মাঝে থাকা অবস্থা-ই তাদের মুকাবিলা শুরু করেছিল। এবং তাদেরকে নিজ স্থান থেকে পালায়ন করতে বাধ্য করালো, সমস্ত মুসলিম লস্কর খুব স্থিরতার সহিদ নদী পার হলো। ইরানীরা লেজ গুটিয়ে পালাতে ছিল আর বলতে ছিল–

ديوا امدند - ديوامدند

অর্থাৎ ভূত আসতেছে- ভূত আসতেছে)

নদী পার হওয়ার সময় এক মুজাহিদের কাঠের একটি পিয়ালা পানিতে পড়ে গিয়েছিল। সে মুজাহিদ্‌ বলতে ছিল– 'আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত আছি। আল্লাহ তা'আলা আমার পিয়ালা আমাকে ফিরায়ে দিবেন। অতপর দেখা গেল সে পিয়ালাটি অন্য একজন মুজাহিদের হাতে এসে গেছে। অথবা স্বয়ং সমুদ্রের ঢেউ উহাকে কিনারায় পৌছিয়ে দিয়েছে। এবং তার মালিক তা নিয়ে নিল। ত্রিশ

হাজার সংখ্যার এই বিশাল মুজাহিদ বাহিনীটি কেমন ধরনের বিপদ-আপদ ব্যতিরেকে খুব সহঝেই কিনারায় উঠেছে। একজন মুজাহিদ নিজের ঘোড়ার নীচে পড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কা'কা (রাঃ) তাকে ঝাপ্টা মেরে উঠিয়ে নিয়েছিলো। লোকেরা বলতে ছিলো–

عجزت النساء ان يلدن مثلك يا قعقعا

অর্থাৎ হে কা'কা! দুনিয়ার কোন মা তোমার মত বীর পুরুষের জন্ম দিতে পারবে না।

(দাওয়াতে জিহাদ)

হযরত আ'লা ইবনে হাদ্রামী (রাঃ) চার হাজার মুজাহিদ সহকারে সাগরে

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর খেলাফত কালে মুরতাদদের বিরুদ্ধে একটি হামলায় হযরত আলা ইবনে হাদ্রামী (রাঃ) কে 'হিজ্র' এলাকা পর্যন্ত ভ্রমণ করতে হয়েছিল। হিজরের মুরতাদদের বিরুদ্ধে সাফল্য পূর্ণ অপারেশনের পর মুরতাদদের একটি গ্রুপ নদী পার হয়ে দারাইন এলাকা পর্যন্ত পৌছেগিয়েছিল। এবং সেখানে শক্তিশালী একটি যুদ্ধের মাঠ কায়েম করে। এবং নদীর আশ-পাশের সব নৌযানগুলো জালিয়ে দিয়েছিল। যেন মুসলমানরা তাদের কাছে আসতে না পারে।

–হযরত আলা ইবনে হাদ্রামী (রাঃ) যখন দরীয়ার কিনারায় আসলেন এবং দেখলেন যে, দুশমন হাতের নাগালের বাহিরে। আর এ দিকে পার হওয়ার জন্য না আছে কোন পুল আর না আছে কোন নৌযান। তখন তিনি দু' রাকাত নফল নামাজ পড়ে এভাবে দো'আ করলেন–

يَا حَلِيْمُ - يَا عَلِيْمُ - يَا عَلِيُّ - يَا عَظِيْمُ اَجِزْنَا -

যখনি মুজাহিদরা সে সাগরে পা রাখলো সাথে সাথে সাগরের পানিতে হালকা নরম বালির বিকাশ ঘটল। মুজাহিদরা একদিন ও এক রাতের সফর সে নরম বালির উপরে-ই করলো। তাদের ঘোড়ার

পায়ের খুর সমূহ ও ভিজলনা। অতপর সেখানে পৌছে-ই ইসলামের শার্দূল সৈনিকরা নিজেদের তীর ও তরবারী দ্বারা মুরতাদদেরকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে জাহান্নামের ঘাট পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছিলেন।

এক কবি এ ঘটনাটি তার কাব্যে এ ভাবে ব্যক্ত করেন–

الم تر ان الله ذلك بحره × وانزل بالكفار احدى الجلائل

دعونا الى شق البحار فجاءنا × باعجب من فلق البحار الاوائل

অর্থ ঃ 'আপনি কি দেখেননি যে আল্লাহ্ তায়ালা সমুদ্রকে কেমনভাবে আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আর কাফেরদের উপর কত কঠিনতর দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা আমাদের প্রভূর নিকট দরিয়া পাড়ি দেয়ার জন্য ফরিয়াদ করেছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পূর্বেকার লোকদের চেয়ে আরও বেশী চমৎকার ও বিস্ময়কর ভাবে সাহায্য করেছেন।

দ্বিতীয় কাব্যটিতে হযরত মুসা (আঃ) এর 'বাহরে কুলযুম' পার হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে প্রবাহিত হতে বাধা দিয়েছিলেন আর এখানে (উল্লেখিত ঘটনায়) তো পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা একে বারে শুকিয়ে-ই দিয়েছেন। তাই পূর্বেকার সে ঘটনা থেকে পরের ঘটনাটি বেশী বিস্ময়কর।

(দাওয়াতে জিহাদ)

সামুদ্রিক সফর কালের ওযিফা

হযরত হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আমার উম্মতের জন্য সমুদ্রের মাঝে ডুবা তেকে পরিত্রানের উপায় নিম্নের বাক্যগুলোতে নিহিত–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(দাওয়াতে জিহাদ)

সাগর বক্ষে মুসলমানদের আধিপত্য

উত্থান যুগে মুসলমানরা ছিল বিশ্ব জগতে উন্নত শির। তামাম দুনিয়ার সাগর-মহা সাগরেই তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। পারস্য উপসাগর ছিল প্রাচ্য দেশ সমূহের নৌকেন্দ্র।

–হিন্দুবাদ ও সিন্দাবাদের কথা আপনারা নিশ্চয় পড়ে থাকবেন। কি মজার কাহিনী তাই না ? এসব কাহিনী কিন্তু ওই সব নৌকেন্দ্রের সাথেই জড়িত। এসব রূপকথা রচনার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জাওয়ানদেরকে সাগর ভ্রমণ ও নৌ- অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

পূর্বাঞ্চলের নৌপথ সমূহ হিন্দুস্তানের উপকূল ঘেঁষে চীন ভাজা, সুমাত্রা ও মালয় প্রভৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত নৌপথগুলো মুসলিম নাবিকদের কারায়ত্তে ছিল। ঐ সব নৌ পথে শুধু ইসলামের ঝান্ডাই উড়তো না বরং ওই বীর নাবিকদের বদৌলতে ভাজা, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামের অশীষবার্তাও পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে এই সব সাগর পথে মুসলমানদের নৌ-চালনা ছিল শান্তিপুর্ণ বাণিজ্য ভিত্তিক।

মুসলিম সওদাগররা জাহাজ যোগে চীন ও ভারত বর্ষ থেকে বাণিজ্য দ্রব্য পশ্চিম দেশে পৌঁছে দিতেন। ভূমধ্য সাগরে মুসলমানদের নৌ শক্তি ছিল জঙ্গি নৌ বহরের। ভূমধ্য সাগরে উপকূলবর্তী প্রায় সবগুলো জাতিই ছিল নৌ-বহরের অধিকারী। নৌ যুদ্ধে ও তারা ছিল পারদর্শী। তাই মুসলমানদেরও নৌবহর সংগঠন ও রণপোত প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ফলে অনতিকালের মধ্যেই ভূমধ্য সাগর মুসলিম অধিকারে আসে। দুনিয়ার কোন নৌ শক্তি তাদের মোকাবেলা করতে পারতো না।

মুসলিম শাসন কায়েমের পর যখন তাঁদের নৌ-কর্তৃত্ব ও অর্জন হল, তখন বিভিন্ন পেশার লোক তাঁদের নিকট চাকরি প্রার্থী হল। মুসলমানরা মাঝি মাল্লা ও নাবিকদের চাকরি দিলেন। তাঁদের সমুদ্রজ্ঞান ও

নৌ-দক্ষতা বৃদ্ধি পেল। বড় বড় নাবিক ও নৌ-বিশেষজ্ঞ তৈরী হল। নৌ যুদ্ধের উৎসাহ বাড়ল। তাঁরা যুদ্ধ জাহাজ বানালেন। সে গুলোকে নৌ সেনা ও অস্ত্র সজ্জিত করলেন। নৌ-বাহিনীকে সমুদ্র পৃষ্ঠে সাওয়ার করালেন। ভূমধ্য সাগরের অপর পাড়ে লড়তে পাঠালেন।

নৌ যুদ্ধের জন্য মুসলমানরা সিরিয়া, আফ্রিকা, মরক্কো ও স্পেনের উপকূল বেচে নিলেন। আব্দুল মালিক ইব্‌নে মারওয়ান আফ্রিকার গভর্ণর হাস্‌সান ইবনে নু'মানকে তিউনিসে জাহাজ নির্মাণ করাখানা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিলেন।

তিনি তিউনিসে এক বিশাল জাহাজ নির্মাণ করাখানা কায়েম করেন। এই কারখানার জাহাজে ভূমধ্য সাগরের বন্দরগুলো ছেয়ে যায়। সে কালের তিউনিস ছিল মুসলমানদের এক বিশাল নৌ কেন্দ্র।

এই নৌ কেন্দ্র থেকেই সিসিলীতে গালবিয়া শাসনামলে যিয়াদাতুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আগলাব সাকালিয়ায় নৌ হামলা চালান। সাকালিয়া পদানত ও কাওসারা বিজিত হয়।

আগলাবিয়াদের উপর উবায়দিয়া ও উমাইয়্যাহ্ শাসনামলে আফ্রিকা ও স্পেনের নৌ-বহর গুলো অপর পাড়ে হামলা চালাত। আব্দুর রহমান আন্‌নাসীরের আমলে স্পেনীয় নৌবহরে প্রায় দুইশত রণপোত ছিল। আফ্রিকার নৌবহরে ও সমসংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ ছিল।

স্পেনীয় আমীরুল বাহর (নৌবাহিনী প্রধান) ছিলেন ইবনে রামাহাস। আর এই জাহাজগুলোর কেন্দ্রীয় বন্দর ছিল 'বিজিয়া' ও 'মারীয়া'। প্রতিটি নৌ বন্দরে আবার একজন উচ্চতর কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকতেন। তিনি সমস্ত জাহাজ, কাপ্তান ও নৌ সেনাদের তত্ত্বাবধান করতেন। প্রতিটি জাহাজের কাপ্তানকে বলা হত 'রঈস' বা সর্দার। রঈস তার জাহাজের পূর্ণ তদারককারী ছিলেন।

যুদ্ধ বাঁধলে সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ বন্দরে একত্রিত করে রণসাজে সজ্জিত করা হত এবং একজন আমীরের অধীনে যুদ্ধে পাঠানো হত।

সোনালী যুগে ভূমধ্যসাগরে সামরিক ঘাঁটিগুলো মুসলমানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে ছিল। খৃষ্টান নৌশক্তি ছিল মুসলমানদের তুলনায় অতি নগন্য। ফলে সর্বত্রই মুসলমানদের নৌ-বিজয় সূচিত হত। ভূমধ্যসাগরের গোটা উপকূল ভাগ অধিকৃত হয়। বিশেষ করে মীওরকা, মানওরকা, ইয়াবিসা, সারদানিয়া, সাকালিয়া, কাওসারা, মাল্টা, ক্রীট ও সাইপ্রাস প্রভৃতি এলাকা।

আবুল কাসেম ও তাঁর পুত্রগণ ভূমধ্যসাগরের বিখ্যাত বন্দর 'মাহ্দিয়া' থেকে নৌ বহর নিয়ে বের হতেন এবং ইউরোপের উপকূল ভাগে হামলা চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা কব্যা করতেন।

দানীয়ার ওয়ালী মুজাহিদ আমিরী ৪০৫ হিজরীতে তাঁর নৌ বহর দিয়ে সারদানিয়া দখল করেন। মুসলমানরা তখন গোটা ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও উপকূল ভাগ শাসন করতেন।

ইবনে হুসাইন খান্দানের আমলে মুসলিম নৌবহর খৃষ্টান নৌবহরের উপর এমন ভাবে হামলা করত যেমনিভাবে বাজপাখী তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন সমগ্র সমুদ্র এলাকায় মুসলমানদের প্রভুত্ব কায়েম ছিল।

যুদ্ধ ও শান্তি সব সময়েই সাগরময় মুসলিম রণ তরীর আনাগোনা লেগে থাকত। কিন্তু খৃষ্টানদের একটি তখতা ও ভূমধ্য সাগরে খুঁজে পাওয়া যেতনা।

উবায়দী আমলে যখন মুসলিম নৌশক্তি গুলো দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন খৃষ্টান নৌ বহর ক্রুশেডারদের নিয়ে সিরিয়া ও মিসরের উপকূলে প্রভুত্ব বিস্তার করে।

কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর (রহঃ) উবায়দীদের উৎখাত করে সিরিয়া ও মিসর উপকূল থেকে খৃষ্টানদের তাড়িয়ে দেন। সুলতান সালাহুদ্দীন মুসলিম নৌবহরের ও উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি আক্কায়

বিরাট আকারের এক নৌ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারখানায় যুদ্ধ জাহাজ তৈরী হতো। সিরীয় উপকূল ছাড়া আরেকটি নৌ কেন্দ্র ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী যখন বাইতুল মুক্কাদাসের যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি মিসরের গভর্ণরকে লিখে পাঠালেন যে "অতি সত্তর জাহাজ বোঝাই করে খাদ্য দ্রব্য ও বীর সেনাদের পাঠিয়ে দাও"।

এই জাহাজগুলো সিরীয় উপকূলে পৌছা মাত্র খৃষ্টান জাহাজ গুলো চার দিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম জাহাজগুলো বিরত্বের সাথে লড়াই করে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় তীরে পৌছায়।

উবায়দী বংশের পতনের পর মুসলিম নৌ বহরের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। অবশ্য আফ্রিকার কয়েকটি বন্দরে কিছু সংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ অবশিষ্ট ছিল।

তবে মরক্কান নৌ বহরের অবস্থা ভালই ছিল। তাদের উপর তখনও কোন আঘাত আসেনি। লামাতুনার শাসনকাল পর্যন্ত আরব নৌ বহরের শক্তি অক্ষুন্ন ছিল। অতঃপর মুয়াহ্হিদের শাসন আমল শুরু হয়। তারাও এই নৌশক্তিকে সমুন্নত রাখেন। মুয়াহ্হিদের উথান কালে স্পেন ও আফ্রিকায় মুসলিম নৌ বহরের আধিপত্য কায়েম ছিল। মুয়াহ্হিদের নৌ বাহিনী প্রধান ছিলেন আহমাদ সাকালী। তিনি সিসিলীর অধিবাসী ছিলেন।

মুসলমানদের গৌরবময় যুগে যুদ্ধের লীলা কেন্দ্র ভূমধ্যসাগরে তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম ছিল। মুসলমানদের বিনা অনুমতিতে ভূমধ্য সাগরে অন্য কোন জাতির কোন যুদ্ধ জাহাজ প্রবেশ করতে পারতো না।

মুসলিম রণপোত গুলো তখন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত শিকারের অন্বেষনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত এবং শিকারের খোজ পাওয়ার সাথে সাথে অকস্মাৎ তার উপর ঝাপিয়ে পড়তো। অন্য কথায়, শত্রু পক্ষের

যুদ্ধ জাহাজ দেখা মাত্রই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসত। এ ভাবে সমগ্র সমুদ্র এলাকায় মুসলমানদের একাধিপত্য কায়েম হয়েছিল।

কিন্তু বাষ্প-যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদের পতন যুগ ও শুরু হল। মুসলমানরা তখন আরাম প্রিয় হয়ে গেল। তারা স্থল ভাগের রাজত্বেই সন্তুষ্ট রইল। সমুদ্রের তরঙ্গঁময় জীবনকে ভয় পেল। ফলে মুসলমানদের নৌশক্তি চিরতরে খতম হয়ে গেল।

আমাদের কর্তব্য এখন পুণরায় নৌশক্তি অর্জন করা। আমাদের তরুন কিশোর ও যুব সমাজ যখন সমুদ্র তরঙ্গেঁর সাথে লড়াই করতে শিখবে, সমুদ্রের অভিজ্ঞান লাভ করবে, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ চালনায় পারদর্শী হবে ঠিক তখনই আমরা আমাদের হারানো নৌশক্তি ফিরে পাব। এটা এক সর্ব সম্মত সত যে, যে জাতির কাছে নৌশক্তি নেই, সে জাতি দুনিয়ায় চিরদিনই দুর্বল হয়ে থাকবে।

কুরআন পাক নদ-নদী, নৌযান ও নৌ ভ্রমণকে আল্লাহর রহমত, বরকত ও নিয়ামত বলে অভিহতি করেছেন। এ কথা আপনারা বইয়ের শুরুর দিকেই পড়ে এসেছেন। তাই এখানে বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক।

যে জাতির নৌবহর মযবুত, দুনিয়াতে সে-ই রাজত্ব করার যোগ্য। দুনিয়ার প্রায় ঐশ্বর্যই তার হাতের মুঠোয়। যার নৌশক্তি কমযোর সে দুনিয়ায় বাস করার অযোগ্য।

(সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি)

মুসলিম নৌবহরের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মু'আবিয়া (রাযিঃ)

মু'আবিয়া নাম। আবূ আব্দুর রহমান কুনিয়াত বা পিতৃবাচক উপনাম। পিতার নাম আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের মধ্যে বিশিষ্ট খানদানের অধিকারী ছিলেন; কুরাইশ বংশের ঝান্ডা তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিল।

আবু সুফিয়ান ও তাঁর স্ত্রী হিন্দা মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের উৎপিড়নে উভয়ই ছিলেন অগ্রণী। ইসলামের মূলোৎপাটন করতে এরা কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন নি। মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ান, হিন্দা ও মু'আবিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার আগে আবু সুফিয়ান ইসলামের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করলেন ও মু'আবিয়া (রাঃ) বিশেষ কোন বৈরিতা প্রকাশ করতেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর, উহুদ প্রভৃতি কোন বড় যুদ্ধেই তিনি কুরাইশদের পক্ষাবলম্বন করেন নি।

কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তিনি তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতেন না। মক্কা বিজয়ের পর তিনি প্রকাশ্যে মুসলমান হন।

কথিত আছে মু'আবিয়া (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুবারকবাদ জানান। মুসলমান হওয়ার পর সর্ব প্রথম তিনি হুনায়ন ও তায়েফের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর 'ওহী' লেখার গুরুদায়িত্ব অর্পন করেন।

আমীর মু'আবিয়ার বীরত্ব পদর্শনের সুযোগ ঘটে প্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর খিলাফত আমলে। তিনি তখন সিরিয়া অভিযানে ভ্রাতা ইয়াযীদ ইবনে সুফিয়ানের সাথে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে সুফিয়ান তখন সিরীয় বাহিনীর প্রধান সেনা নায়ক ছিলেন।

সিরিয়া অভিযানে মু'আবিয়া (রাঃ) বড় বড় কীর্তি প্রদর্শন করেন। রোমান বাহিনীর সাথে লড়াই করতে করতে তিনি আমোদ অনুভব করতেন। সিরিয়ায় রোমকদের বিরুদ্ধে প্রায় সবগুলো যুদ্ধেই তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। সিরিয়া বিজয়ের পর মু'আবিয়ার (রাঃ) ভ্রাতা ইয়াযীদ ইব্‌নে আবী সুফিয়ান সিরিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে হযরত উমর (রাঃ) গভীর শোকাভিভূত হন। কেননা, ইয়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান সৈন্য সংগঠন ও রাজ্য শাসনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) মু'আবিয়াকে সিরিয়ার গভর্ণর নিয়োগ করেন। কারণ মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন সরেস অন্তঃকরণের সুপরুষ। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও অমিত সাহসিকতার জন্য হযরত উমর (রাঃ) তাকে 'কিস্‌রা-ই-আরব, উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফত কালে মু'আবিয়া (রাঃ) চার বছর কাল সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন। সিরিয়ায় শান্তি, শৃংখলা, দেশ শাসন ব্যবস্থা ও সৈন্য বিন্যাসে তিনি এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মু'আবিয়া (রাঃ) গোড়াতেই রোমান বাহিনীর সহিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সিরিয়ায় রোমান স্থল বাহিনী ও নৌ বাহিনী দু-ই পাশাপাশি অবস্থান করত। তাই সিরিয়ার উপকূল অঞ্চলে রোমের স্থল বাহিনী ও নৌ বহরের যুগল সমাবেশ ঘটেছিল। মু'আবিয়া (রাঃ) স্থল যুদ্ধে রোমানদের দাত ভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর ওই সব যুদ্ধে তিনি সর্বদা সফলকামও হতেন। কিন্তু নৌবহরের কোন জবাব তার কাছে ছিল না। মুসলমানদের নৌ বাহিনী না থাকায় তারা সিরিয়ার উপকূল অঞ্চল রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। রোমান নৌবহরের বারংবার উপকূল অঞ্চলে হামলা, আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) স্বচক্ষে অবলোকন করছিলেন। তার অন্তরাত্মা মুসলিম নৌবহর প্রতিষ্ঠা কল্পে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কেননা, তিনি পাল্লায় পড়েছিলেন রোমান যুদ্ধবাযদের। আর একটি শক্তিমান নৌবহর ছাড়া রোমকদের সম্পূর্ণ পরাজিত করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না।

এ ঘটনার পেক্ষাপটে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট এই মর্মে এক খানা দরখাস্ত পেশ করেন যে, রোমানদের যথোচিত মুকাবিলা নিবন্ধন মুসলিম নৌবহর গঠন করা অবশ্যক।

হযরত উমর (রাঃ) তখন মু'আবিয়াকে নৌবহর গঠনে হাত দিতে বারণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) সে সময় মুসলিম নৌ বহর গঠনকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে তখন নৌবহর প্রতিষ্ঠার চাইতে ও অধিক গুরুওপূর্ণ কাজ পড়েছিল।

কিন্তু আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) এরপর ও অধিক পীড়াপীড়ি করতে থাকলে উমর (রাঃ) এ ব্যাপারে অন্যান্য গভর্ণরের পরামর্শ চেয়ে পাঠান। তাঁর তখন পর্যন্ত মুসলিম নৌবহর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ফলে হযরত উমর (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ) এর আবেদন নাকচ করে দেন।

হযরত উমর (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলে হযরত উসমান (রাঃ) মুসলমানদের খলীফা নিযুক্ত হন। তার খিলাফত কালেও আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) একই ভাবে নৌ বাহিনী গঠনের আবেদন পেশ করেন। হযরত উসমান (রাঃ) তার আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে শর্তারোপ করেন যে, নৌ বাহিনীতে লোক ভর্তির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক হতে হবে। কাউকে এ ব্যাপারে জবরদস্তি করা চলবেনা।

অনুমতি পেয়ে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) দ্রুত মুসলিম নৌবহর গঠনে তৎপর হন এবং অনতিকালের মধ্যে একটি শক্তিশালী নৌ বহর গঠন করে আটাশ হিজরীতে সাইপ্রাস আক্রমন করেন। সাইপ্রাস বাসীরা টাল সামলাতে না পেরে সন্ধি করতে বাধ্য হয় সন্ধির শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ।

১. মুসলমানদের বার্ষিক সাত হাজার স্বর্ণ মুদ্রা কর দেয়া হবে। রোমকদের ও সমপরিমাণ অর্থ দান করা হবে। মুসলমানদের তাতে কোন আপত্তি থাকবে না।

২. সাইপ্রাস কারো দ্বারা আক্রান্ত হলে মুসলমানরা তার মুকাবিলার যিম্মাদার হবে না।

৩. মুসলমানরা রোম আক্রমন করতে চাইলে সাইপ্রাস তাদের জন্য পথ ছেড়ে দিবে।

এই অঙ্গিকারের চার বছর পর বত্রিশ হিজরীতে সাইপ্রাস সন্ধির বরখেলাফ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমকদের যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে সাহায্য করে।

আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) তেত্রিশ হিজরীতে পাঁচ'শ রণপোত বিশিষ্ট এক বিরাট নৌ বহর সহ ভূমধ্যসাগরে অবতীর্ণ হন এবং সাইপ্রাসের উপর প্রচন্ড আঘাত হানেন। প্রথম দফায়ই সাইপ্রাস মুসলিম বাহিনীর করতলগত হয়। আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস দ্বীপে এগার হাজার মুসলমানদের পূর্ণবাসিত করেন।

তিউনিস, আলজিরিয়া ও মরক্কো-আফ্রিকার ঐ সব উপকূলীয় অঞ্চল রোম সম্রাজ্যের অন্তরভূক্ত ছিল। হযরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফত কালে এইসব এলাকায় রাশি রাশি রোম সৈন্য নিহত হয়। এ কারণে রোমের কায়সর (কায়সর প্রাচীন রোম সম্রাটদের উপাধি) প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মও হয়ে উঠে।

কায়সর মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার মানসে বিরাট সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কায়সর কখনও এতবড় সামরিক আয়োজন গ্রহণ করেনি। রোমান রণপোতের সংখ্যা ছিল ছয়'শ। আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) তার উপযুক্ত জবাব দান মানসে স্বীয় রণবহর সহ সামনে অগ্রসর হন। এমন সময় সমুদ্রে প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়। অগত্যা উভয় পক্ষই তখন এক রাতের জন্য আপসে সন্ধি বদ্ধ হন। উভয় পক্ষ যার যার মতে আল্লাহর ইবাদতে মাশগুল হন।

পরদিন ভোরে রোমান বাহিনী যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুত হল। মুসলিম বাহিনী ও সামনে উপস্থিত হল। রোমান বাহিনী হঠাৎ হামলা শুরু করল। মুসলিম বাহিনী ও চকিতে পাল্টা জবাব দিল।

উভয় তরফ থেকেই তরবারী চলতে লাগল ঘোরতর যুদ্ধের ফলে সাগরের পানি রক্তে লাল হয়ে উঠল।

যুদ্ধের স্থল থেকে উপকূল পর্যন্ত রক্তের ঢেউ খেলছিল। দুই তরফের বীর যুদ্ধারা কেটে কেটে সাগরে পড়ছিল। আর সাগরের পানি তাদের উছলে উছলে দূরে নিক্ষেপ করছিল। এই ভয়ংকর যুদ্ধ দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকল।

আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) স্বীয় স্থির সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে সৈন্য পরিচালনা করতে লাগলেনা। পরিশেষে রোমান বাহিনীর কদম দুলে উঠল এবং রোমান বাহিনী প্রধান নঙ্গর তুলে পালায়ন করল।

রোমকদের নৌযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর মু'আবিয়া (রাঃ) ভূমধ্যসাগরেকে জঞ্জাল মুক্ত করলেন। রোমকদের ধাওয়া করতে করতে কনষ্টান্টিনোপল উপসাগরের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে গেলেন। মোটের উপর পূর্ণ আটঘাট বেঁধেই মু'আবিয়া (রাঃ) রোমকদের মোকাবিলায় নেমে ছিলেন। তিনি রোমকদের যেমন স্থল যুদ্ধে মার দিয়েছিলেন, তেমনি তাদের নৌযুদ্ধেও পর্যুদস্ত করেছিলেন।

এরপর অভ্যন্তরীণ মতনৈক্যের দরুণ কিছুদিন মুসলমানদের বিজয়াভিযান মুল্তবী থাকে। কিন্তু চুয়াল্লিশ হিজরীর দিকে এই মতনৈক্য স্তিমিত হওয়ার পর আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) পুণরায় তার নৌ তৎপরতা শুরু করেন। রোমকদের নৌ-মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আমীরুল বাহারকে পাঠাতে লাগলেন। তারা খুব সফল ভাবেই রোমানদের মুকাবিলা করতে থাকেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এর পুত্র আব্দুর রহমান কয়েক বার রোমকদের সার্থক মোকাবিলা করেন। বুস্র ইব্নে আবী আরযা ভূমধ্য সাগরে মুসলিম নৌবহর রেস্ দিয়ে ফিরতেন। উনপঞ্চাশ হিজরীতে মালিক ইবনে হুবায়রা (রাঃ) রোমকদের সাথে যখন তখন যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। ফুযালা, খিরা জয় করে করে বিপুল মালে গণীমত হাসিল করেন। অনুরূপ ভাবে ইয়াযীদ ইবনে শাজ্রা রাহাবী বহুবার নৌ হামলা চালিয়ে রোমান শক্তিকে তছনছ করে দেন।

আটচল্লিশ হিজরীতে উক্বা ইবনে আমির মিসরীয় বাহিনীর সাথে নৌযুদ্ধে লিপ্ত থাকেন।

এ সব সামরিক অভিযান ছিল নৌযুদ্ধের মহড়া স্বরূপ। আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) এই সব নৌ-মহড়ায় অতি পুলক বোধ করতেন। তার মনস্কামনা ছিল মুসলিম নওজোয়ানদের নৌযুদ্ধে পারদর্শী করে তোলা। তাই মু'আবিয়া (রাঃ) এর যুগে বিপুল সংখ্যক মুসলিম আমীরুল বাহার সৃষ্টি হন এবং তারাই রোমান শক্তিকে চিরতরে খতম করে দেন।

আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) কনষ্টানটিনোপল আক্রমন করেন। এই আক্রমনের জন্য তিনি স্থল ও নৌবাহিনীকে সংগঠিত করেন। কনষ্টানটিনোপলের অত্যাধিক গুরুত্ব ছিল। কারণ, কনষ্টানটিনোপল ছিল পূর্ব ইউরোপের প্রাণ কেন্দ্র।

আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) কনষ্টানটিনোপল আক্রমন করে খৃষ্টান শক্তি সমূহ বিশেষ করে রোমকদের বিতাড়িত করতে কৃতসংকল্প ছিলেন। তদুপরি একটি মুসলিম নৌ বহর গঠন করাও ছিল তার ঐকান্তিক অভিলাস।

তার এই অভিলাসের কারেণই ভূমধ্য সাগরে মুসলিম নৌ বহরের লিলাক্ষেত্র পরিণত হল। আমীর মু আবিয়ার আকাঙ্খা ছিল ভূমধ্য সাগরের সবগুলো দ্বীপ দখল করে সিরি আনাতোলিয়া ও মিসর পরিবেষ্টিত ভূমধ্য সাগরীয় উপকূলাঞ্চল সমূহকে রোমকদের নৌ-হামলা থেকে চির নিরাপদ রাখা।

উনপঞ্চাশ হিজরীতে মু'আবিয়া (রাঃ) সুফিয়ান ইবনে আওফের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন এই রণ বহরটি ভূমধ্য সাগরের তরঙ্গের সাথে খেলতে খেলতে বস ফোরাস প্রণালীতে প্রবেশ করে। কনষ্টানটিনোপল ছিল রোমকদের মস্ত বড় সমর কেন্দ্র। তারা মুসলমানদের মুকাবিলা করল এবং তীব্রভাবেই করল। ফলে মুসলমানদের পিছু হটতে হল। কনষ্টানটিনোপল অজেয় থাকল।

যা হোক হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এর আমলে মুসলমানদের বছরে অন্তত কয়েক দফা করে রোমকদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হত। এ সব যুদ্ধে মুসলমানরা অনেকগুলো দ্বীপ দখল করেন।

তিপান্ন হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) আনাতোলিয়ার অদূরবর্তী 'রোডস' দ্বীপ অধিকার করেন। এই দ্বীপটি সামুরিক দৃষ্টিকোন থেকে নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমীর মু'আবিয়া এটি দখল করে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করেন।

অনুরূপ ভাবে চুয়ান্ন হিজরীতে তিনি কনষ্টানটিনোপলের সন্নিহিত 'ইরওয়াদ' দ্বীপ দখল করে সেখানে ও মুসলমানদের বসতি স্থাপন করেন। এ সময় সাকালিয়া দ্বীপেও মুসলমানরা হামলা করেন। কিন্তু তা বিজিত হয় নি।
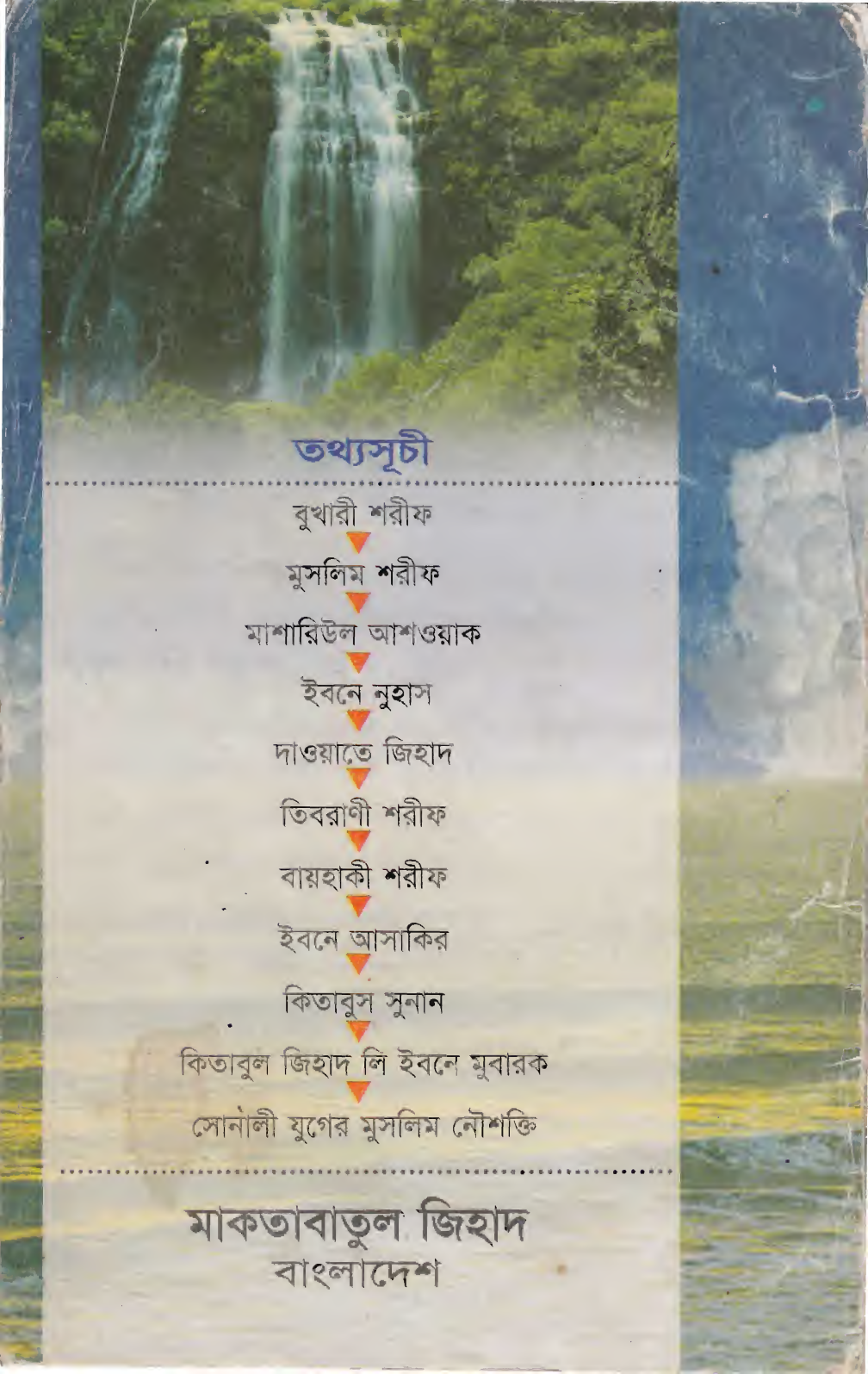
ষাট হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। তার গোটা শাসনকাল হচ্ছে উনিশ বছর তিন মাস। তিনি মুসলিম নৌ বহর গঠনের ক্ষেত্রে যে সংকল্প, দৃঢ়তা ও স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। তাঁর সংগঠিত নৌ বাহিনীই অভিজ্ঞ রোমান নৌ বাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাভূত করেছিল।

তার শাসন আমলেই মুসলিম নৌ বহরের উৎকর্ষ সাধিত হয়। অত্যল্প কালের মধ্যেই মুসলিম নৌ বহর সুবিখ্যাত রোমান নৌ বহরকেও ছাড়িয়ে যায়।

আমীর মু'আবিয়া কেবল মুসলিম নৌ বহরেরই প্রতিষ্ঠাতা নন, বরং জাহাজ নির্মাণেরও তিনিই সূচনা করেছিলেন। তিনি তার শাসন আমলে বেশ কয়েকটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন। সিরিয়া ফিলিস্তীন ও মিসরের উপকূলে কারখানা নির্মাণ করেন।

আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) স্বতন্ত্র নৌ-বিভাগ কায়েম করে তার উন্নয়ন বিধান করেন। রণবহর, নৌসেনা, নৌসমরোপকরণ ও তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এই বিভাগেরই অধীনে ছিল।

(সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি)

তথ্যসূচী
বুখারী শরীফ
মুসলিম শরীফ
মাশারিউল আশওয়াক
ইবনে নুহাস
দাওয়াতে জিহাদ
তিবরাণী শরীফ
বায়হাকী শরীফ
ইবনে আসাকির
কিতাবুস সুনান
কিতাবুল জিহাদ লি ইবনে মুবারক
সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি
মাকতাবাতুল জিহাদ
বাংলাদেশ